৫৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUN 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

(গত সংখ্যার পর)

কোর্সের শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষার পর প্রথম বর্ষের এবং শেষ বর্ষের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কোন পরীক্ষার্থী কোর্সের ১ম বর্ষ অথবা শেষ বর্ষের পরীক্ষায় এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করলে সে পরবর্তী বৎসরের সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়ে শুধুমাত্র অকৃতকার্য বিষয়েই পরীক্ষা দেবে। তিনের অধিক বিষয়ে ফেল করলে তাকে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

আমাদের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি মূলত বহিঃপরীক্ষা নির্ভর। কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা ছাড়া অন্তঃপরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এটাই হলো আমাদের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি। সেজন্য সুপারিশ হলো— পরীক্ষায় থাকবে দু'টো অংশ; অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা। বহিঃপরীক্ষা নেবে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আর অন্তঃপরীক্ষা নেবে স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার গড় করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারিত হবে। অন্তঃপরীক্ষায় থাকবে টিউটরিয়াল, মৌখিক পরীক্ষা ও বছরের ২টি সেমিস্টারের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা। যে সকল বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে সে সকল ব্যবহারিক পরীক্ষাও অন্তঃপরীক্ষা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা উভয়টাতেই পৃথকভাবে পাশের নম্বর থাকতে হবে।

অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান

অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপ :

যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে সে সব বিষয়ে :

টিউটরিয়াল	-	১৫	নম্বর
মৌখিক	-	১০	”
ব্যবহারিক	-	২৫	”
লিখিত	-	৫০	”
মোট নম্বর	-	১০০	নম্বর

যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই সে সব বিষয়ে :

টিউটরিয়াল	-	১৫	নম্বর
মৌখিক	-	১০	”
লিখিত	-	৭৫	”
মোট নম্বর	-	১০০	নম্বর

যে সকল বিষয়ে ব্যবহারিক নম্বর ২৫-এর অধিক সে সকল বিষয়ের নম্বর বণ্টন ভিন্নভাবে করতে হবে। পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটে বহিঃপরীক্ষার পাশাপাশি অন্তঃপরীক্ষার নম্বরও লিখিত থাকবে।

অন্তঃপরীক্ষার নম্বর পরীক্ষা গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতিস্বাক্ষরে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে। তাঁরা এই নম্বর সংরক্ষণ করে রাখবেন এবং তাঁদের নিজেদের গৃহীত বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল যখন তাঁদের কাছে আসবে; তখন তাঁরা অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষায় পেল ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর এবং বহিঃপরীক্ষার নম্বরের গড় করে চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করবেন। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয়ে একজন পরীক্ষার্থী অন্তঃপরীক্ষায় পেল ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর এবং বহিঃপরীক্ষায় পেল ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ নম্বর। এখন সমন্বয়ের মাধ্যমে সে পাবে (৫০+৬০)÷২=৫৫ নম্বর। পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটে বহিঃপরীক্ষার নম্বরের পাশাপাশি অন্তঃপরীক্ষার নম্বরও লিখিত থাকবে।

অন্তঃপরীক্ষা নিয়েই জটিলতা সবচেয়ে বেশি। একজন শিক্ষক ভয়ে অথবা লোভে অথবা নিজ ছাত্রছাত্রীর প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোন পরীক্ষার্থীকে বেশি নম্বর দিয়ে দিতে পারেন। আবার আক্রোশমূলকভাবে অথবা অন্য কোন কারণে কোন পরীক্ষার্থীকে কম নম্বরও দিতে পারেন। এ উভয় প্রবণতাকে প্রতিরোধ করে সঠিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে পারলেই অন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

দা কমিশন এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। কমিশনের ত, "কেউ কেউ মনে করেন যে, অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কার্যের উদ্দেশ্য ষ্ট শিক্ষকবৃন্দ তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ তাঁরা রীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান । কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষকগণ তাঁদের এই দায়িত্বের অবমাননা করবেন না। কোন ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণত উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে।...ক্লাসের ছাত্রগণ যে ছাত্রকে দুর্বল বলে জানে, তাকে বেশি নম্বর দিয়ে কোন শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন না। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি তাঁদের নিজেদের ছাত্রদের তৎপরতাকে অন্যায় বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁদের মূল্যায়ন সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার মূল্যায়নের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সামঞ্জস্যহীন হয় তা হলে তাদের মূল্যায়নের ওপর সংশ্লিষ্ট কারও আস্থা থাকতে পারে না। এমনকি তাতে সর্ব সাধারণেরও আস্থা থাকবে না। ফলে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে। তাই নিজেদের সুনাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষার্থীগণকে অন্তঃপরীক্ষায় উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।" অধ্যায় ২১, ধারা ২৩। মফিজউদ্দিন কমিশনও প্রায় একই কথাই বলেছেন। অধ্যায় ২১, ধারা ৩৫।

অন্তঃপরীক্ষার নম্বর যদি সকল ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের নোটিস বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হয়, তাহলে নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অবমূল্যায়ন অথবা অতিমূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট সকলের চোখে ধরা পড়বে; এজন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমালোচিত হবেন। তদুপরী শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি অন্তঃপরীক্ষার নম্বর অনুমোদন করবে এ মর্মে একটি বিধান রাখা যেতে পারে।

এ ছাড়াও একটা বিধান এভাবে চালু করা যেতে পারে যে, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার নম্বর একত্রিত করে সমন্বয় করবেন, তখন যদি দেখা যায় যে, উভয় পরীক্ষার নম্বরের পার্থক্য শতকরা ২০ বা ততোধিক, তাহলে সর্বনিম্ন নম্বরটাই গৃহীত হবে। অর্থাৎ একজন পরীক্ষার্থী অন্তঃপরীক্ষায় পেল ৭০ নম্বর আর বহিঃপরীক্ষায় পেল ৫০ নম্বর। এক্ষেত্রে গড়ের সুবাদে তার পাওয়ার কথা (৭০+৫০)+ ২=৬০ নম্বর। কিন্তু যেহেতু দু'পরীক্ষার নম্বরের পার্থক্য ২০ কাজেই সে পাবে ৫০ নম্বর। এ বিধান চালু হলে একদিকে বাহিরের কোন প্রভাবশালী মহল চাপ প্রয়োগ করে অধিক নম্বর পেতে, অথবা কোন শিক্ষক পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে বেশি নম্বর দিতে উৎসাহী হবেন না। আবার, অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বহিঃপরীক্ষায় নকলবাজি করে নম্বর পাওয়ার চেষ্টাও নিরুৎসাহিত হবে।

মোদ্দা কথা, যেহেতু বহিঃপরীক্ষার পদ্ধতিটি বেশ ত্রুটিপূর্ণ এবং এ পরীক্ষা দিন দিন তার গুরুত্ব হারাতে বসেছে, সেজন্য অন্তঃপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অধিক অপরিহার্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। কাজেই এখন প্রয়োজন অন্তঃপরীক্ষার সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। এজন্য শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে সুপারিশসমূহ আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।

অন্তঃপরীক্ষার বিধান চালু হলে (ক) ছাত্র-ছাত্রীকে সারা বছর পড়ালেখার কাজে মনোযোগী থাকতে হবে। ভর্তির পর পর উধাও হয়ে যাওয়া এবং দু'বছর পর হঠাৎ আবির্ভাব হয়ে পরীক্ষা দিতে চেষ্টা করা বন্ধ হবে।

(খ) শিক্ষক শিক্ষিকার সামাজিক মর্যাদা যেমন বাড়বে, তাদের কাজের পরিধিও তেমনি বাড়বে।

(গ) ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার চর্চাও বৃদ্ধি পাবে। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ভাল পরিবেশ গড়ে উঠবে।

(ঙ) পূর্বতন পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পরবর্তী কোর্সে ভর্তি হওয়ার বিধান গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

৩. স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর : এ দু'টি কোর্স পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও পড়ানো হয়। আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ "বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ" নামে অভিহিত সরকারী বেসরকারী কলেজেও পড়ানো হয়। কিন্তু উভয়স্থানে পরীক্ষা পদ্ধতি এক নয়। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে সেমিস্টার পদ্ধতিতে এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে সনাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যেহেতু পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত সেমিস্টার পদ্ধতি অধিক গ্রহণযোগ্য, সেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতি পরিহার করে সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তদুপরি উল্লিখিত দু'টি কোর্সে উভয় শ্রেণীর শিক্ষাঙ্গনে এক ও অভিন্ন সিলেবাস অনুসরণ করা উচিত। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে উভয় শ্রেণীর শিক্ষাঙ্গনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৪. মাদ্রাসা : মাদ্রাসায়ও সাধারণ শিক্ষার সমমানের ১ম শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে, মাদ্রাসা পরীক্ষারও ঐ সমস্ত স্তরে ঐ একই ধরনের সুপারিশ করা যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রের জন্য কতগুলো সাধারণ সুপারিশ রাখা হলো—

১) বর্তমানে প্রচলিত মেধাতালিকা অর্থাৎ ১ম থেকে ২০তম স্থান নির্ধারণ থাকবে না। শ্রেণী বা বিভাগ উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে 'এ' গ্রেড, 'বি' গ্রেড, 'সি' গ্রেড ইত্যাদি চালু করতে হবে।

২) পরীক্ষা পাশের জন্য ন্যূনতম নম্বর হবে ৪০। ৩৯ নম্বর পেলেও তাকে বাড়িয়ে ৪০ নম্বর করা যাবে না।

(চলবে)